নির্বাচিত গ্রন্থ থেকে

এই পাতাটি নতুন সংযোজিত হলো। এখানে বিভিন্ন নির্বাচিত গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হবে তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য। পাঠকেরাও নিজেদের আগ্রহ অনুযায়ী এরকম অংশ নির্দেশ করে পাঠাতে পারেন। এর সঙ্গে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রন্থ পরিচিতি শিরোনামে আরেকটি পাতা যোগ হবে।

স্যার জেমস গোল্ডস্মিথ, *The Trap*, ক্যারোল অ্যান্ড গ্রাফ পাবলিশার্স, ১৯৯৪

এই গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বীজ ব্যবহার করার বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হচ্ছে :

এক. এটা ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে কৃষিতে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লব আনয়ন ঘটনার মত এক ধরনের বিপজ্জনক পুনরাবৃত্তি। সে সময় রাসায়নিক সার ব্যবহারে এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাকৃতিক পদ্ধতিগুলোর পরিবর্তে সকলে রাসায়নিক সার ব্যবহারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, ফলে রাতারাতি উৎপাদনও বেড়ে গেল। জেনেটিক্যালি 'শক্তিশালী' বীজের সরবরাহ শুরু হল, যা পরিচিতি পেল 'আশ্চর্য প্রজাতি' হিসেবে। এই প্রক্রিয়াতেই একক ফসল উৎপাদনের জোয়ার শুরু হল। বিস্তীর্ণ জমিতে একক প্রজাতির মাত্র একটি ফসল বোনার আগ্রহ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পাশাপাশি কৃষিতে যন্ত্রের আগমন ঘটল। বাড়তি ফসল উৎপাদনে জ্বালানি ও রাসায়নিকের চাহিদা বেড়ে গেল। 'রাইট লাইভলিহুড অ্যাওয়ার্ড' (যা বিকল্প নোবেল নামেও পরিচিত) বিজয়ী ফোলার ও মনির মতে, 'বাড়তি উৎপাদন নিশ্চিত করতে দরকার ছিল সার আর সেচ ব্যবস্থার। এই সার আর সেচ ফসলের পাশাপাশি আগাছাকেও বাড়তি পুষ্টি জোগাত, ফলে প্রয়োজন হল আগাছা নিরোধক ওষুধের। একই সময়ে একই প্রজাতির ফসল আকৃষ্ট করল ফসলখেকো পোকাকে, ফলে কীটকাশকের চাহিদা বাড়ল।...এই প্রক্রিয়াতে রাসায়নিক সার যেমন নতুন জাতের ফসল উৎপাদন সম্ভব করল আবার একই সাথে এই নতুন জাত টিকিয়ে রাখার জন্য সারের প্রয়োজন স্থায়ী রূপ পেল।'

দুই. কোম্পানির দাবিকৃত আগাছা নিরোধক বীজ প্রকৃত অর্থে আরও নতুন ও শক্তিশালী আগাছানাশকের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার সাম্প্রতিক এক গবেষণা দেখিয়েছে যে পরাগরেণু ১ হাজার মিটার দূর পর্যন্ত চলে যেতে পারে এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির সংমিশ্রণে নতুন বৈশিষ্ট্য তৈরি করে। এ প্রসঙ্গে রুটগারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ডেভিড ইরেনফেল্ড বলেন, 'মাত্র কয়েক মৌসুমের ব্যবধানেই এই জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারড আগাছা নিরোধক বীজের প্রজাতি নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়।'

তিন. পৃথিবী নিয়ত পরিবর্তনশীল, এটি পরিবর্তিত হয়, অভিযোজিত হয়। ঠিক একইভাবে পোকামাকড়ও নিজেদের পরিবর্তন করে এবং কীটনাশকের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে অভিযোজিত হয়, আগাছানাশকের বিরুদ্ধে অভিযোজিত হয় আগাছা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক বছরের ব্যবধানে কীটনাশকের ব্যবহার দশ গুণ বৃদ্ধি সত্ত্বেও পোকার আক্রমণে ফসলের ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে দ্বিগুণ।

একইভাবে যে বাহকের মাধ্যমে রোগ ছড়ায় সেটাও পরিবর্তিত হতে পারে এবং নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। কাজেই জেনেটিক্যালি মডিফায়েড প্রজাতির বীজে যে কৃত্রিম রক্ষণভাগ গড়ে তোলা হয় তা ভেঙে ফেলতে খুব বেশি সময় লাগে না। সেই সাথে একই প্রজাতির ফসল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে লাগানোর ফলে যে কোন একটি রোগের কারণে গোটা ফসলই মার খেয়ে যেতে পারে। এই অভিযোজিত বাহক কিংবা রোগের ব্যাপারে বিজ্ঞানীরাও নিশ্চিত নন, তাই এটির চরিত্র ও ক্ষমতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীও করা যায় না।

চার. প্রকৃতিতে অপরীক্ষিত ও অনুমোদনহীন বীজের প্রজাতি ছড়িয়ে দেয়া রোধ করা কখনই সম্ভবপর নয়। ১৯৮৬ সাল থেকে শুরু করে এ ধরনের ঘটনার অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়।

পাঁচ. জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারড বীজের মাধ্যমে একক ফসলের চাষাবাদ পৃথিবীর প্রাকৃতিক জেনেটিক সম্পদের দারুণ ক্ষতি করবে। জিনগত বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য প্রকৃতির এক অনন্য দান। অনেক বছর আগে বৃক্ষ রোগতত্ত্ববিদ মার্টিন উলফ এবং জিনতত্ত্ববিদ জন ব্যারেট নিশ্চিত করে বলেছিলেন যে বহু ফসলের সম্মিলিত চাষাবাদ একফসলি আবাদের থেকে ভাল। তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে তিন ধরনের বার্লির একত্রিত চাষাবাদ ফাঙ্গাস আক্রমণ থেকে প্রায় পুরোপুরি পরিত্রাণ দিতে পারে, অপরদিকে এই তিন প্রজাতির বার্লি আলাদা আলাদা চাষ করলে এই প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখা যায় না। তাঁরা বলেন যে একক উৎপাদন কোন নির্দিষ্ট বছরে বাড়তি ফলন আনতে পারে কিন্তু বহু প্রজাতির একত্রিত চাষাবাদ লম্বা সময় ধরে একটানা ফলন দেয়, যা একক উৎপাদনের থেকে বেশি।' (পৃ. ১২৩-১২৫)

আয়েশা সিদ্দিকা, *Military Inc.*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৭

'বাণিজ্যিক কার্যক্রমে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততার ব্যাপারে সমাজের প্রভাবশালী অংশের নির্লিপ্ততার পেছনে নিজ নিজ স্বার্থ কাজ করে। সামরিক বাহিনী নির্ভর রাজনীতিতে উপস্থিত প্রভাব বিস্তারকারী অন্য উপাদানগুলো ফৌজিতন্ত্রের দুষ্টচক্রের মধ্যে বাঁধা পড়ে এবং এই প্রক্রিয়ায় উভয়েই লাভবান হয়। ইন্দোনেশিয়ার উদাহরণ দিয়ে এ বিষয়টি খুব সহজেই প্রমাণ করা যায়। ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সেনাবাহিনীর সাথে সম্পদ ভাগাভাগির ব্যাপারে সমঝোতা বজায় রেখে চলে। সেখানে রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দ সামরিক বাহিনীকে ব্যবসায় সম্পৃক্ত হতে সমর্থন দেয় এবং পরস্পরের অর্থনৈতিক লাভালাভ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ক্ষমতায় নিজ নিজ অংশীদারি পাকাপোক্ত করে। বাজেট বরাদ্দের সময় রেখে দেয়া যে ফাঁকফোকরগুলোর কারণে ফৌজি অর্থনীতি ফুলেফেঁপে ওঠে তা জাকার্তা কখনই মেরামত করেনি। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের জোগান এবং বাহিনী সদস্যদের ব্যক্তিগত খরচ মেটানোর ব্যর্থতার কারণ দেখিয়ে ইন্দোনেশিয়ার সরকার ফৌজি ব্যবসার সুযোগ করে দিয়েছিল, লক্ষ্য ছিল যে এর মাধ্যমে সামরিক বাহিনী নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজন মেটাবে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই প্রয়োজন পরিণত হয় লোভে এবং উর্দি পরা জেনারেলরা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহায়তায় এক নতুন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

...পাকিস্তানে বর্তমানে সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি এক বিশাল আকার ধারণ করেছে। এটি এখন পাকিস্তানের অন্যতম

অর্থনৈতিক অংশীদার। সেখানে ফৌজি ব্যবসা চলে মূলত চারটি ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে। এগুলো হল : ফৌজি ফাউন্ডেশন, আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, শাহীন ফাউন্ডেশন, বাহরিয়া ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশনগুলো সামরিক বাহিনীর অধীন। এখানে সামরিক ও বেসামরিক উভয়েরই কাজ করার সুযোগ আছে। এদের ব্যবসা বহুমাত্রিক। বেকারি, ফার্ম, স্কুল থেকে শুরু করে বৃহদাকার কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান; যেমন–বাণিজ্যিক ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, রেডিও-টেলিভিশন চ্যানেল, সার কারখানা, সিমেন্ট কারখানা–এসবই তাদের ব্যবসার অন্তর্গত। সামরিক বাহিনীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং এতে প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততার বিষয়টি কোন স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হয় না, কাজেই এই ফৌজি ব্যবসার প্রকৃত মূল্য হিসাব করা বেশ কঠিন। এরা মহাসড়কে টোল আদায় করে, আবার গ্যাস স্টেশনও চালায়, শপিং মলের ব্যবসা করে আবার ছোট আকারের ব্যবসাও পরিচালনা করে।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জমি দেয়া থেকে শুরু করে গড়ে তোলা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকরিসহ নানাবিধ সুবিধা দেয়া হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমি এভাবে বিলিবণ্টন করার মাধ্যমে দেশের সম্পদ ব্যক্তি খাতে চলে যায়। প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব ব্যবহার করে ব্যক্তিগত লাভালাভ অর্জনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার হয় এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো। সামরিক বাহিনীর প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষমতার মাধ্যমে নিজেদের জন্য নিত্যনতুন ব্যবসা সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হয়, যা অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিযোগীর জন্য অসম ক্ষেত্র তৈরি করে। ব্যক্তিগত অর্জন বা সম্পদের হাতবদলের বিষয়টি ক্ষমতার অপব্যবহারের দিকটি সামনে নিয়ে আসে। সামরিক বাহিনীর জন্য এ ধরনের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলা আর টাকা কামানোর অবাধ সুযোগ রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা আর প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব ব্যতীত অর্জন করা অসম্ভব।'... (পৃ. ১৩, ১৮-১৯)

আহমদ ছফা, একাত্তর : মহাসিন্ধুর কল্লোল, *বেহাত বিপ্লব* ১৯৭১, আহমদ ছফা মহাফেজখানা, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা : সলিমুল্লাহ খান, অন্বেষা প্রকাশন, ২০০৭

'আমাদের কথায় আসি। সে সময়টিতে ফরহাদ মজহার এবং কবি হুমায়ুন কবীর–দুজনের সঙ্গে আমার পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে। গোটা দেশের রাজনীতিতে একটা উত্তাল তরঙ্গ ফুঁসে ফুঁসে উঠছিল। মওলানা ভাসানীর জ্বালাও পোড়াও ঘেরাও আন্দোলন খান সাহেবের সামরিক শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। তারপর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়েছে। ছাত্রদের ক্রমাগত আন্দোলন চলছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র একটা থমথমে বিশৃঙ্খল অবস্থা : 'প্রলয় ঝড়ের পূর্বে প্রকৃতি যেমন'।

এ ধরনের একটি পরিস্থিতিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের লেখক-সাহিত্যিকরা যে ভূমিকা পালন করে আসছিলেন, সেটাকে কিছুতেই গৌরবজনক বলা যাবে না। আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পরে লেখক-সাহিত্যিকদের কিনে নেয়ার জন্য 'পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন। ওই প্রতিষ্ঠানের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার সদর দপ্তর ছিল ঢাকায়। বাংলা একাডেমির সামনে গেটের কাছে যে গুমটিঘরটা আছে, ওটাকে লেখক সংঘের অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হত। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত নামকরা লেখক-সাহিত্যিক ওই লেখক সংঘের সদস্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দলাদলি ছিল, অনেক উপদল ছিল, কিন্তু কোটারিভুক্ত প্রতিটি উপদলই নিজেদের ফায়দা হাসিলের জন্য তৎপর থাকত। দেশের বিরাজমান পরিস্থিতির প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার পরিবর্তে তাঁরা রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা আদায় করার ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। সে জন্য আন্দোলনের গতিবেগের তীব্রতা যত বাড়ছিল, লেখক-সাহিত্যিকদের ভূমিকার প্রতি জনগণের ঘৃণাও ততই তীব্র হয়ে উঠেছিল।

সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সর্বত্র মিটিং চলছে। কিন্তু লেখকদের মধ্যে তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। এই লেখক-সাহিত্যিকদের অনেকেই ছিলেন আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শ্রদ্ধেয়। তাঁদের নিষ্ক্রিয়তা দেখে আমরা নিজেরা লজ্জিত হতাম এবং মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতাম। খুব সম্ভব ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে হবে, বদরুদ্দীন উমরকে প্রেস ক্লাবের একটি সভায় মন্তব্য করতে শুনলাম, মহিলারাও দু-দুটি মিছিল করে ফেলেছেন, আমাদের লেখক-সাহিত্যিকদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তিনি খুব কষে লেখক সংঘের উদ্দেশ্যে নানা কটূক্তি করলেন। সেগুলো ছিল নিরেট সত্য।' পৃ. ২৯-৩০

মহিউদ্দিন আহমদ, *জাসদের উত্থান পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪

'ছাত্রলীগের যেসব কর্মী সিরাজুল আলম খানের প্রতি অনুগত ছিলেন, তাঁরা এ সময় সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন। কিন্তু মূল দর্শন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। 'অগ্নিযুগের' বিপ্লবীরা তখন তাঁদের আদর্শ। বাঘা যতীন, সূর্য সেন, প্রীতিলতা, সুভাষ বোস তাঁদের আইডল। একই সময় চে গুয়েভারা, ফিদেল কাস্ত্রো তাঁদের মনোজগতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিতে থাকেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভক্তির পর তখন যেসব রাজনৈতিক দল এ দেশে রুশ ও চীনা পার্টির লাইন অনুসরণ করত, সিরাজ গ্রুপের কর্মীরা তাঁদের ব্যাপারে ছিলেন নিরাসক্ত ও হতাশ। যে কোন আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষকের দাবি ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা নিয়ে তাঁদের ভাবাবেগ ছিল না। একমাত্র লক্ষ্য ছিল পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করা। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই এটা সম্ভব হবে। তবে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র মিশিয়ে একটা অগোছালো রাজনীতির প্রচার শুরু হলে তাঁরা মনি গ্রুপের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হন। উনসত্তরের গণ-আন্দোলনে এই দ্বন্দ্ব চাপা পড়ে থাকলেও সত্তরের শুরু থেকেই তা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিভিন্ন কলেজে ছাত্রসংসদের নির্বাচন উপলক্ষে এই দ্বন্দ্ব খোলাখুলিভাবে প্রকাশ পায়।

...যে কোন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে দেশ-বন্দনা অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তখন খারাপ বা নেতিবাচক কোন কিছু ধরা পড়ে না। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রয়োজনে আইকন বা বীর খোঁজার একটা সচেতন প্রয়াস থাকে। শেখ মুজিব এ রকম একজন প্রতীকে পরিণত হলেন।

সিরাজ গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা যাঁর যাঁর মত স্লোগান তৈরি করতেন। সভায় কিংবা মিছিলে কোনটা জনপ্রিয় হত, কোনটা হত না। এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল। তবে সব কিছুই একজন বা কয়েকজন মিলে সৃষ্টি করেছেন, এমনটা দাবি করা যায় না। উদারহণস্বরূপ 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটির কথা উল্লেখ করা যায়।

১৯৬৮ সালের কথা। ছাত্রসংসদের নির্বাচনি প্রচার উপলক্ষে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগ নভেম্বর মাসে চার পৃষ্ঠার একটা প্রচারপত্র প্রকাশ করে। এর নাম ছিল 'প্রতিধ্বনি', সম্পাদক আমিনুর রহমান। শেষের পৃষ্ঠায় দুটো লেখা ছিল, দুই কলামে। প্রথম কলামে ছিল ছাত্রসংসদের পক্ষ থেকে একটা বিবৃতি। শিরোনাম ছিল 'কর্মমুখর অতীতের স্বাক্ষর'। এতে বিগত ছাত্রসংসদের কর্মকাণ্ডের একটা ফিরিস্তি ছিল।

দ্বিতীয় কলামে ছিল ছয় দফা কর্মসূচির বর্ণনা। শিরোনাম ছিল : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রস্তাবিত পূর্ব বাংলার 'মুক্তি সনদ' ছয় দফা। 'বঙ্গ বন্ধু' দুই শব্দে আলাদা করে ছাপা হয়েছিল। শেখ মুজিবের জন্য এই উপাধির আবিষ্কর্তা ছিলেন ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের নেতা এবং ওই সময়ে ঢাকা নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক মুশতাক। তাঁর চিন্তা ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মত একটা জুতসই কিছু শেখ মুজিবের জন্য খুঁজে বের করা। এই ভাবনা থেকেই বঙ্গবন্ধু শব্দের উৎপত্তি। বিষয়টি একসময় সিরাজুল আলম খানের কানে যায়। তিনি এটা 'অনুমোদন' করেন। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবকে রেসকোর্স ময়দানে (পরবর্তী সময়ে যার নাম হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে যে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল, সেই সভায় তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে ঘোষণা দেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারে ছাত্র ইউনিয়নের উভয় গ্রুপেরই আপত্তি ছিল। সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা এবং ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা এ নিয়ে এতটাই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে তিনি ওই সভায় মঞ্চের ওপর বসেননি। মঞ্চে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানও উপস্থিত ছিলেন। রাজনীতিতে শেখ মুজিবের একচেটিয়া ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার পথে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। এটা পরবর্তী সময়ে তাঁর নামের অপরিহার্য অংশ হয়ে যায়। শেখ মুজিবের নামের আগে বঙ্গবন্ধু না বললে কেউ কেউ প্রচণ্ড রকম ক্ষুব্ধ হতেন। এখনও হন।

আগরতলা মামলা বাতিল হয়ে যাওয়ার পর সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে কথা বলে শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের ব্যাপারে অবহিত হন। তিনি উৎসাহ বোধ করেন, তবে বিষয়টা নিয়ে হইচই করতে নিষেধ করেন। ওই সময় ছাত্রলীগের মধ্যে সমাজতন্ত্র নিয়ে আলাপ-আলোচনা হত প্রকাশ্যেই। অবশ্য সমাজতন্ত্রের বিরোধীরা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগে বেশ শক্তিশালী অবস্থানে ছিলেন। শহীদ মিনারে '৬৭ সালে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের এক যৌথ সভায় ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' বলে স্লোগান দেয়ায় ছাত্রলীগের একদল কর্মী তাঁদের ওপর চড়াও হন এবং কয়েকজনকে আহত করেন। এমনকি ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও মাঝমধ্যে সমাজতন্ত্র নিয়ে ব্যঙ্গ করতেন। ছাত্রলীগের নেতা নূরে আলম সিদ্দিকীর একটি প্রিয় স্লোগান ছিল, 'হো হো মাও মাও–চীনে যাও ব্যাঙ খাও'।

...পঁচাত্তরের ১ জানুয়ারি সিরাজ শিকদারকে চট্টগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ কর্মকর্তা মারুফুল হক তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে চোখ বেঁধে বিমানে করে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। তেজগাঁও বিমানবন্দরে তাঁকে নামানো হলে পুলিশের ইন্সপেক্টর কায়কোবাদ তাঁর বুকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দেন। মালিবাগে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে কিছুক্ষণ রাখার পর অতিরিক্ত নিরাপত্তার কারণে তাঁকে শেরেবাংলা নগরে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়। ঢাকার পুলিশ সুপার মাহবুব উদ্দিন আহমদকে জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্ব দেয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পদ্ধতি নিয়ে মাহবুবের তেমন 'সুখ্যাতি' ছিল না। ওই রাতেই তাঁকে হত্যা করা হয়। লেখা হয় 'ক্রসফায়ারের' চিত্রনাট্য। একটা প্রেস নোটে বলা হয়, পুলিশ তাঁকে নিয়ে অস্ত্রের সন্ধানে সাভারে গিয়েছিল। গাড়ি থেকে লাফিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গুলিতে সিরাজ শিকদার নিহত হন। দিনটা ছিল পঁচাত্তরের ২ জানুয়ারি। পুলিশ সুপার মাহবুব ও সিরাজ শিকদার ছিলেন ছোটবেলার বন্ধু।

তাঁরা দুজনই বরিশালে একসময় লেখাপড়া করেছেন। কুদরত (মাহবুবের ডাকনাম) এবং সেরা (সিরাজ শিকদার)–এই দুজনের বন্ধুত্বের কথা বরিশাল শহরের অনেকেই জানতেন। জীবনের শেষ প্রহরে সেরা তাঁর বাল্যবন্ধু কুদরতের সঙ্গে আবার মিলিত হলেন। তবে অন্যভাবে। ৩২ বছর বয়সের মোস্ট ওয়ান্টেড এই তরুণের এভাবেই জীবনের করুণ সমাপ্তি ঘটে। সিরাজ শিকদারের লাশ তাঁর মা-বাবার কাছে হস্তান্তর করা হয়। ঢাকার মোহাম্মদপুরে তাজমহল রোডের পাশে জামে মসজিদ সংলগ্ন গোরস্তানে পুলিশ পাহারায় তাঁকে দাফন করা হয়।' (পৃ. ২১-২২, ২৪, ১৫৪-১৫৫)

আনু মুহাম্মদ, *উন্নয়নের বৈপরীত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৮

'বাংলাদেশে খাদ্যসংকটের জন্য জনসংখ্যা দায়ী–এ রকম কথা বহুল প্রচলিত। কিন্তু অনেক দেশে মাথাপিছু খাদ্যপ্রাপ্যতা কমলেও, তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু খাদ্যপ্রাপ্যতা ১৯৭২-এর তুলনায় এখন বেড়েছে। ১৯৭২-এর সাড়ে ৭ কোটি জনসংখ্যার তুলনায় এখন দেশে জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। সে সময় মোট খাদ্যশস্য (চাল ও গম) উৎপাদন ছিল ১ কোটি টন। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯-১০ অর্থবছরের খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে ৩ কোটি ৩১ লাখ টনের ওপর। ২০১০-১১ অর্থবছরে তা বেড়ে ৩ কোটি ৬০ লাখ টন, ২০১৭ সালে প্রায় ৪ কোটি টনে দাঁড়িয়েছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭)। অর্থাৎ জনসংখ্যা যেখানে হয়েছে দ্বিগুণের একটু বেশি, খাদ্য উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৪ গুণ।

তারপরও দেশে সরকারি হিসাবে এখনও ৪ কোটির বেশি মানুষ, প্রচলিত সংজ্ঞার যে দারিদ্র্যসীমা, তার নিচে বাস করেন। শুধু তাঁরাই নন, যাঁরা প্রচলিত দারিদ্র্যসীমার একটু ওপরে আছেন, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে তাঁদের সামাজিক অবস্থার পতন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে নিরাপদ যথেষ্ট খাদ্য ও যথাযথ পুষ্টিমানসহ 'খাদ্য নিরাপত্তা'র সামগ্রিক শর্তাবলি বিবেচনায় দেশের প্রায় ১২ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা সব সময়ই ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

...১৯৭২-৭৩ পর্যন্ত কীটনাশক বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হত। যখন চাষিরা এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন তখন প্রথমে যুক্তি দেয়া হয় এই বলে যে 'অপচয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে সরকার আগামী বছরের শুরুতে ন্যূনতম মূল্য ধার্য করার পরিকল্পনা নিচ্ছে'। এক বছরের মাথায় সরকার ইউরিয়া সারের মূল্য ১০০ শতাংশ এবং ফসফেট ও পটাশ সারের মূল্য ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করে। সেই ধারাই অব্যাহত আছে।

ক্রমে কীটনাশক, রাসায়নিক সার এবং শ্যালো ও ডিপ টিউবওয়েল–সব কিছুরই চাহিদা বাড়ে, ব্যবহার বৃদ্ধি পায়, দামও বাড়ে সবগুলোরই। এগুলো নিয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দুই পর্যায়েই বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দাপটে এই ক্ষেত্রও ক্রমে রাষ্ট্রের হাত থেকে ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। যে রাসায়নিক সার কৃষকরা একসময় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই সার নিয়েই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও সংকট তাঁদের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৯৫ সালে সার সংকটের সময়, সার সংগ্রহ করতে এসে কৃষকরা তা পেতে ব্যর্থ হন, উদ্ভ্রান্ত উত্তেজিত উৎপাদকদের ওপর পুলিশ গুলিও চালায়। সে বছর সারসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনায় পুলিশের গুলিতে নিহত হন ১৭ জন কৃষক।' (পৃ. ১৮, ২০)

গ্রন্থনা (ও অনুবাদ): মওদুদ রহমান